International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-IV, January 2017, Page No. 29-39
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

ঔপনিবেশিক ভারতে মুসলিম 'জাতি চেতনা' ও রাজনীতি

সেলিমুদ্দিন মন্ডল
স্নাতকোত্তর ছাত্র (২০১৩-১৫), পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাত, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

'Nationalism' or 'national consciousness' is an important and complicated issue of colonial India. Nationalism refers to a united national consciousness. But in the mixed culture of the countries like India, where the presence of more than one religion or communities, the dissemination of national consciousness was not possible to ignore religion or communities entity. We know that nationalism in the early colonial stage was originally a Hindu nationalism. There were highlighted in the spirit of Hinduism, which was largely anti-muslim. In that time, it is believed that the politics of Indian national congress was to be led by the Hindu nationalist. So, one part of the Muslim became the main rival of the congress politics. And they made a plan to improve their religion or community through separate politics and distinct races. In that context, the Aligarh movement – establishment of Muslim league – later demanding of separated Muslim habitats in united India, all of these activities of Muslim leaders is called the duration of Muslim national consciousness. Although the end of this is not good enough. Because, for this, we have seen united India was divided into 'India' and 'Pakistan' – two separated countries. In the meantime, integral national consciousness was blended with religions community based on consciousness. As a result the Indian national consciousness was not integrated; it was divided into two separated religions communities based on consciousness. Thus, in that time religion communities became the nation/races. The main objective of my article is to show the reason why Muslims became an individual race in colonial India and how did they establish their identity through separate politics.

Keywords: National consciousness, Hindu nationalism, Muslim nationalism, Muslim politics, partition.

ভূমিকা : ঔপনিবেশিক ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও তার থেকে যে রাজনীতি - সেটার আলোচনা খুব জটিল। কেননা ভারতের মতো মিশ্র সংস্কৃতির দেশে, যেখানে একাধিক ধর্ম বা সম্প্রদায়ের উপস্থিতি, সেখানে জাতীয়তাবোধ বা চেতনা প্রচারের ক্ষেত্রে ধর্ম বা সম্প্রদায়গত সত্ত্বাকে সবসময় উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। জাতীয়তাবাদ বা জাতীয়তাবোধ বলতে একটি দেশের অখণ্ড জাতির চেতনা বা উন্নয়নকে বোঝানো হলেও ভারতের মতো বহুজাতিক দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে যে জাতীয়তাবাদ প্রচার করা হয়েছিল, সেখানে প্রধানত হিন্দু জাতির (ধর্মের) চেতনা বা উন্নয়নকেই তুলে ধরা হয়েছিল। রামোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখরা এবং পরবর্তীতে চরমপন্থীরা যে জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রচার করেছিল তা ছিল মূলত হিন্দুজাতির

চেতনা। মনে করা হয় যে এই হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনার সমর্থনে পরিচালিত হতে শুরু করেছিল জাতীয় কংগ্রেসী রাজনীতি, যার প্রধান বিরোধী হয়ে উঠেছিল মুসলমানেরা (ব্যতিক্রম - মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, বদরুদ্দিন তায়েবজি প্রমুখ নেতা)। ফলস্বরূপ বিংশ শতকের প্রথম থেকে আমরা অখণ্ড ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বা জাতীয়তাবোধের দুটি ভিন্ন ধারা লক্ষ্য করতে পারি - যার একদিকে ছিল কংগ্রেসী রাজনীতি, যাকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের সমর্থন বলে মনে করা হয়েছিল এবং অন্যদিকে ছিল কংগ্রেস তথা হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিরোধী মুসলিম রাজনীতি, যা ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের (জাতির) উন্নয়নের জন্য। কেননা ঔপনিবেশিক আমল থেকে ভারতের মুসলমানরা অনেক দিক থেকে পিছিয়ে ছিল। তাই তারা নিজেদের সম্প্রদায়গত এবং স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বা ও রাজনীতির মাধ্যমে স্বজাতির উন্নতি ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছিল। সেদিক থেকে আলিগড় আন্দোলন - মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা - পরবর্তীতে অখণ্ড ভারতের মধ্যে পৃথক মুসলিম বাসস্থানের দাবি - এই পর্যায়ক্রমে নেতাদের যে প্রচেষ্টা তাকে অনেকেই মুসলমান জাতীয়তাবোধ বা চেতনার সময়কাল বলেছেন। যদিও এর শেষ পরিণতি ভালো হয়নি। কেননা এর ফলে যে দ্বিমেরুকরণ জাতিসত্ত্বা ও রাজনীতির সূচনা হয়েছিল, তার পরিণতি আমরা লক্ষ্য করেছিলাম অখণ্ড ভারতবর্ষ বিভাজিত হয়ে ভারত ও পাকিস্থান দুটি দেশ সৃষ্টির মাধ্যমে। আসলে এসময় অখণ্ড ভারতীয় চেতনার সঙ্গে ধর্ম ও সম্প্রদায়গত আদর্শ বা চেতনা মিলেমিশে গিয়েছিল। ফলে ভারতীয় জাতীয় চেতনা আর অখণ্ড রইল না, তা বিভাজিত হয়ে পৃথক ধর্ম ও সম্প্রদায় ভিত্তিক জাতি চেতনায় পর্যবেসিত হয়েছিল। অর্থাৎ এসময় ধর্ম সম্প্রদায় পরিণত হল জাতিতে, যার পশ্চাদে ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও ঔপনিবেশিক শক্তির প্ররোচনা।

উল্লেখ্য, ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ওয়াহাবি, ফরাজি বিভিন্ন আন্দোলনে কেবল মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নতি ও মুসলিম ধর্মের পুনরুজ্জীবনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এই সময় মুসলমানদের মধ্যে পৃথক 'জাতি' চেতনা তৈরি হয়নি। এমনকি দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান একত্রে বসবাস করা সত্ত্বেও ইতিপূর্বে তাদের মধ্যে সেভাবে পৃথক জাতিচেতনার মনোভাব সঞ্চার হয়নি। কিন্তু ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পরেই মুসলমানদের মধ্যে স্বতন্ত্র জাতি চেতনা এবং **'separate identity'** প্রতিষ্ঠার চেতনা দেখা দিতে শুরু করল। আমাদের আলোচ্য বিষয় হল - কিভাবে ঔপনিবেশিক ভারতে মুসলমানদের মধ্যে পৃথক জাতিচেতনা ও রাজনীতির প্রেক্ষিত সৃষ্টি হল ও সেটি কিভাবে প্রসার লাভ করল?, তা দেখানো।

পৃথক 'জাতি' চেতনায় ঔপনিবেশিক মানস : আমরা জানি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতের মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আগের তুলনায় অনেক খর্ব হয়েছিল। তাই মুসলমানরা মুঘল তথা মুসলমান সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী ব্রিটিশদের নিজেদের শত্রু বলে মনে করতে শুরু করেছিল। এমনকি স্বধর্ম থেকে পতিত হওয়ার ভয়ে তারা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিল। অন্যদিকে হিন্দুরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সরকারি চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেতে থাকে, স্বভাবতই সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমানরা হিন্দুদের থেকে পিছিয়ে পড়তে থাকে। (**W.W HUNTER** –এর "**THE INDIAN MUSALMANS**" গ্রন্থে ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতীয় মুসলমানদের পশ্চাদপদতার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়)। অর্থাৎ হিন্দুরা ব্রিটিশদের সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের অগ্রসর করতে শুরু করলে উচ্চশ্রেণির মুসলমানেরা হিন্দুদের এই মানসিকতাকে মেনে নিতে পারেনি। ফলস্বরূপ উচ্চশ্রেণির মুসলমানেরা ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব দেখাতে শুরু করেছিল।

কিন্তু ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমান সমানে লড়াই করলেও বিদ্রোহের পর হিন্দু সমাজের একাংশ ইংরেজ বিরোধী হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে মুসলমান সমাজ এক শতাব্দী ধরে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা সত্ত্বেও মহাবিদ্রোহের পর তারাই আবার এগিয়ে এল ইংরেজ সরকারকে সহযোগিতা করতে, নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য। এক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সহজ সম্পর্ককে নষ্ট করেছিল

ঔপনিবেশিক সরকারের মানসিকতা। বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই তথ্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। বিপিনচন্দ্র পালের সম্পাদনায় সিলেট থেকে প্রকাশিত 'পরিদর্শক' পত্রিকা লিখেছিল :

> *হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জন্য সরকার দায়ী। সরকার বলছে, প্রত্যেকে নিজেদের উন্নতির চেষ্টা করবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুরা হিন্দু ও মুসলমানেরা মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির চেষ্টা করছে। ফলে দু'জাতির মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে।*[১]

ইতিহাসবিদ বদরুদ্দিন উমর-এর মতে, ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সূচনায় হিন্দু-মুসলমানদের স্বার্থ সংঘাতকে ইংরেজরা উপেক্ষা করল না। উপরন্তু নিজেদের সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে এই বিভেদকে স্বীকৃতি দিয়ে অনেক কৌশলে এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তারা স্থাপন করল। এই ভেদনীতির মুনাফা নিয়ে ইংরেজদের হিসেবে কোনো ভুল ছিল না। ভারতীয় সমাজ জীবনে সিপাহি বিদ্রোহের পর যে সম্প্রদায় চেতনা দেখা দিল, সে চেতনা জাতীয় চেতনার মধ্যে অনেক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল।[২]

অধ্যাপক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ঔপনিবেশিক ভারতে মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতি (সম্প্রদায়) সত্ত্বার বিকাশে ঔপনিবেশিক মানসিকতার ভূমিকাকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে –

> *ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে ঔপনিবেশিক ধারণার মূলে ছিল এদেশীয় সমাজে 'পৃথকীকরণের' চিন্তা। সরকারি তরফে জাতিতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজের মধ্যে নিহিত বিভেদ আদমশুমারির প্রতিবেদনে উক্ত বিভাজন গুলিকে নথিবদ্ধ করা হতে থাকে। আদমশুমারিতে জাতিগত বর্গীকরণের ক্ষেত্রে ধর্মকেই মূল ধরা হয় এবং সেই অনুযায়ী জনসংখ্যাগত ও উন্নয়নমূলক তথ্যেরও শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। এর ফলে প্রত্যেকটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সামাজিক তুলনামূলকভাবে বাস্তবিক অবস্থার একটি আপাত নৈবক্তিক ছবি পাওয়া গেল আদমশুমারির প্রতিবেদনে। এইভাবে সামাজিক বর্গীকরণের বিষয়টি নথিভূক্ত করায় গড়ে ওঠে 'সম্প্রদায় হিসেবে ধর্মের' নতুন ধারণা। এই ধারণাই প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলের স্থানীয় সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে ঔপনিবেশিক আমলে উপমহাদেশীয় ধর্ম সম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। এইভাবে ঔপনিবেশিক জ্ঞানালোকে ধর্মের পূর্ণব্যাখ্যা হয়, যাকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রতিটি কাঠমোয় অর্ন্তভূক্ত করা হয়। ঔপনিবেশিক সরকার প্রজাদের যেসকল সুযোগ সুবিধা দিত, সেখানেও ধর্মের পূর্ণব্যাখ্যাকেই অনুসরণ করা হত। এইরকম বাতাবরণের মধ্যেই ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক পূর্ণগঠিত হয় উনিশ শতকের শেষে। হিন্দু সম্প্রদায় যত সংবদ্ধ হতে থাকে, 'ওরা' মুসলমান এই ধারণার অনুশীলন ততই বাড়তে থাকে এবং মুসলমানেরা হীন বলে গণ্য হতে থাকে। মুসলমানরাও তাদের সম্প্রদায়গত সত্তা আবিষ্কার করার চেষ্টা করে কল্পিত অতীত ও ধর্মের ভিত্তিতে।*[৩]

এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক মশিরুল হাসান লিখেছেন– মুসলমানদের একটা অংশ "ঔপনবেশিক শাসকদের ধারণা অনুযায়ী নিজেদের হিন্দুদের থেকে পৃথক, সুসংবদ্ধ এবং ঐক্যবদ্ধ ভাবতে শুরু করে।" তারা এইসব ধারণাগুলিকে একজাতীয় করতে শুরু করে মুসলমান সম্প্রদায় সত্তা তৈরির উদ্দেশ্যে। সেই সত্তাই পরে বৃহত্তর হয়ে জাতীয়ত্ত্বের ধারণায় পরিণত হয়।[৪]

মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ও পৃথক সংগঠন : উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই পাশ্চত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তরা তাদের ধর্ম ও সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন নতুন আলোকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল এবং বিভিন্ন সংগঠন তৈরি করেছিল। নবজাগরণের জোয়ারে হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতি-শিক্ষা এক নতুন মাত্রা লাভ করে। এই নবজাগরণের অগ্রদূত ছিলেন রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, অরবিন্দ ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখরা। বাংলা ছাড়াও মহারাষ্ট্রেও এই নবজাগরণ আত্মপ্রকাশ করেছিল। মহারাষ্ট্রে এই নবজাগরণের নেতৃত্বে ছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, গোপালকৃষ্ণ গোখলে

এবং বাল গঙ্গাধর তিলক। মূলত ভাববাদী বাঙালি ও বাস্তববাদী মারাঠাগণের এই জাগৃতি 'হিন্দু-জাগৃতি' রূপে চিহ্নিত হয়েছিল। কাজী আব্দুল ওদুদের ভাষায়: "The ideaist Bengalee and practical Marahatta combined in calling the Awakening a Hindu Awakening."[৫] কেননা এই জাগরণ মুসলমানদের স্বার্থের জন্য ছিল না, স্বভাবতই এই জাগরণের প্রভাব মুসলমানদের মধ্যে তেমনভাবে প্রতিফলিত হয়নি।

এজন্য ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশেষত মহাবিদ্রোহের পর থেকে উদীয়মান মুসলিম বুদ্ধিজীবিরা মুসলমান সমাজের পশ্চাদপদতা দূরীকরণে ও তাদের পাশ্চত্য শিক্ষায় উদ্যোগের জন্য এগিয়ে আসে। ভারতে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে এইসময় আবির্ভূত হয়েছিলেন উত্তর ভারতে সৈয়দ আহমেদ খান এবং বাংলায় আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলী প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। এঁরা মূলত মুসলমান সমাজের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি দূর করতে ও বিভিন্ন ভাবে মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য সচেষ্ঠ হয়েছিল। এই প্রচেষ্ঠাকে অনেকে মুসলিম নবজাগরণের প্রচেষ্ঠা বলে মনে করেছেন।

যদিও শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'বাঙালি মুসলমানদের সাধারণ স্তরে একটি বিশিষ্ট মুসলমানী সত্তা দাঁনা বেঁধে উঠেছিল ঊনিশ শতকের গোড়া থেকে, নানারকম ইসলামীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি চরমপন্থী রাজনীতি, হিন্দু পুনর্জাগরণবাদ, গোহত্যাকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতে দঙ্গার প্রভাব ইত্যাদি বাংলার স্বাভাবিক সামাজিক সংগঠনকে দৃঢ় করতে সহায়তা করেছিল, যেখানে ইসলামীয় চেতনা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তবে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ইসলামীয় চেতনার বিকাশে উচ্চকোটি মুসলমানদের সরাসরি কোনো উদ্যোগ ছিল না। যদিও এই চেতনা উচ্চকোটির মুসলমানদের রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় হয়ে এবং আলাদা মুসলমান স্বার্থের কথা চিন্তা করতে শিখিয়েছিল। এজন্য ১৮৫৫ সালে বাংলার প্রথম মুসলমান সংগঠন আঞ্জুমান-ই-ইসলামী দুই ধরণের লক্ষ্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমটি ছিল মুসলমানদের স্বার্থপূরণে উৎসাহ দেওয়া এবং রাজনৈতিক স্বার্থে ব্রিটিশদের কাছে মুসলমানদের আনুগত্য প্রকাশ করা। এইভাবে বাংলার মুসলিম রাজনীতিতে আধুনিকীকরণের অভিযান শুরু হয়ে যায় ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ। ১৮৬০-এর দশকে এই অভিযান আরও জোরদার হয়ে ওঠে এবং স্পষ্ট দুটি ধারা নজরে পড়ে। একদিকে ছিল আব্দুল লতিফ খান ও তাঁর মহামেডান লিট্যাররি সোসাইটি (১৮৬৩) এবং অন্যদিকে ছিল সৈয়দ আমির আলী ও তাঁর সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশান (১৮৭৭-৭৮)।'[৬] যদিও অধ্যাপক অমলেন্দু দে মন্তব্য করেছেন যে :

> *''আব্দুল লতিফ ও আব্দুল রউফ প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমান-ই-ইসলামী কলকাতা(১৮৫৫), নবাব আমির আলির ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিইয়েশান(১৮৫৬), আব্দুল লতিফের মহামেডান লিটেরারী সোসাইটি অব ক্যালকাটা (১৮৬৩) প্রভৃতি সংগঠনগুলি উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুসলমানদের স্বার্থকে তুলে ধরেছে।''*[৭]

তবুও বাংলার জনজীবনে আঞ্জুমান বা স্থানীয় সংগঠনগুলি মুসলমানদের সক্রিয় করে তুলেছিল, তেমনি ঊনিশ শতকের শেষে ভারতের বিভিন্ন স্থানীয় সংগঠন যেমন – আঞ্জুমান, পাড়ার সংগঠন, আখড়া, উৎসব সমিতি ইত্যাদি গণসাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। সেইসব সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধীরে ধীরে সীমারেখা টেনে দিতে থাকে। সেই সঙ্গে গড়ে ওঠে ধর্মীয় প্রতীক ভিত্তিক সাংস্কৃতিক সত্তা, সম্প্রদায়গত ভাবাদর্শ এখানে 'সংস্কৃতি মূলক সত্তা' হিসাবে গড়ে ওঠে। আয়েষা জালালের মতে, ঊনিশ শতকের শেষে দেশীয় সংবাদপত্র এবং সমৃদ্ধশালী লোকপ্রিয় উর্দু কবিতার আনুকূল্যে পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে মুসলমানদের মধ্যে ''ধর্মীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ সাংস্কৃতিক সত্তা'' গড়ে ওঠে। প্রকাশ্য আবৃত্তির আসরে উর্দূ কবিতা পাঠ ও মুশায়ারা উচ্চকোটির ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করত।[৮] যৌথ মূল্যবোধ এবং স্বার্থের ওপরে ভিত্তি করে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক বা ভাবাদর্শগত সাম্প্রদায়িক সত্তা পুর্নগঠিত হয়। এই সাংস্কৃতিক সত্ত্বাই পরে মুসলমানদের প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিতে প্রযুক্ত হয়।

সৈয়দ আহমেদ ও পৃথক জাতীয়ত্বের সূচনা : ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্রের মতে, মুসলিম বুদ্ধিজীবিরা যখন লক্ষ্য করলেন দেশের কোনো অংশে মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষায় ও সরকারি চাকরিতে হিন্দুদের থেকে পিছিয়ে পড়ছে তখন তারা এজন্য হিন্দুদের হয়, সরকারের মুসলিম বিরোধীকে এবং উচ্চশ্রেণির মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষাকে উপেক্ষা করার ঘটনাকে দায়ী করেছেন। এক্ষেত্রে সৈয়দ আহমেদ খাঁ নিঃসন্দেহে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ভারতীয়দের অন্যতম। নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-৯৩) ও সৈয়দ আমির আলী (১৮৪৯-১৯২৮) বাংলাকে কেন্দ্র করে মুসলমান স্বার্থরক্ষায় যে আন্দোলন করেছিলেন, স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁ (১৮১৭-৯৮) উত্তর ভারতে সেই রকম একই কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তিনি যে শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচি নিয়েছলেন তাতে সাম্প্রদায়িক পক্ষ্পাতিত্ব বা বিরূপতা ছিল না। ১৮৬০-এর দশকে তিন যে অসংখ্য বিজ্ঞান সমিতি গঠন করেছিলেন সেগুলিতে হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষই ছিলেন। আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে বিরূপ মনোভাব দূর করার জন্যে তিনি বিশেষ ভাবে স্থাপন করেছিলেন আলিগড় কলেজ।[৯] সৈয়দ আহমেদ ১৮৮৫-তে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত জাতিতত্ত্বের বিরোধীতা করে হিন্দু-মুসলমান মিলের কথা সোচ্চারে প্রচার করেছিলেন এবং হিন্দু ও মুসলমান ও খ্রিস্টান যারাই এদেশে বাস করেন তাদেরকে এক কৌম-এর (জাতি'র) অন্তর্ভূক্ত বলে উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর এই কৌম বা অখণ্ড জাতির পরিষ্কার উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৮৪ সালের এই বক্তব্যে –

> *"for ages the word qaum has been used for people of a country though they may consist of distint groups O Hindus and Muslims are you the residents of any other country but India ? Do you not inhabit this land? Are you not buried in it or cremated on it? Surely you live and die on the same land Remember that Hindus and Muslims are religious terms otherwise, Hindus, Muslims and Christians who live in this country are by virtue of this fact one qaum. Now, when all these groups are called one qaum they should act as such for the common good of the country which is good for all of them."*[১০]

তবে ১৮৮৫-তে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সূচিত হয়। এইসময় তিনি নিজের পুরানো ধারণা পরিত্যাগ করে মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে উল্লেখ করলেন এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের দাবি তুললেন। তিনি ঘোষণা করলেন- ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান অখণ্ড জাতি নয়। তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন বসবাস করার ফলে জীবন পদ্ধতির কিছু সাধারণ উপাদান গড়ে উঠেছিল ঠিকই কিন্তু তার দ্বারা ভারতবর্ষ একটি জাতিতে পরিণত হয়নি। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে তিনি বললেন হিন্দু স্বার্থান্বেষী ও মুসলমান স্বার্থ বিরোধী। কংগ্রেস যে গণতান্ত্রিক নির্বাচন চাইছিল, তাঁর মতে তা মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে উপযোগী নয়।[১১] অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে পৃথক জাতিতত্ত্বের বা দ্বিজাতি তত্ত্বের ধারণা সৈয়দ আহমেদ খানের হাত ধরেই আত্মপ্রকাশ করেছিল।

কিন্তু যে সৈয়দ আহমেদ খান একদা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য সোচ্চার হয়েছিলেন, তিনি কিভাবে হঠাৎ নিজের মত পরিবর্তন করে মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতি ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব ব্যক্ত করলেন? এক্ষেত্রে একটি কারণ ছিল ব্রিটিশ প্ররোচনা। এসময় হান্টার মুসলমানদের দুরাবস্থা ও পশ্চাদপদতা দূরীকরণের জন্য সরকারের কাছে কিছু প্রস্তাব দেন এবং মুসলমানদের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি করতে অনেকাংশে সক্ষম হন যে সরকারের আনুকূল্যের উপরই মুসলমানদের ভাগ্য ও উন্নতি নির্ভরশীল। এই দৃষ্টিভঙ্গি যে তৎকালীন মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত মুসলমানদের মধ্যে পৃথকভাবে চলার প্রবনতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে এবিষয়ে ইংরেজদের সন্দেহ ছিল না। অন্যদিকে থিয়েড়র বেক আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হবার পর থেকেই স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেন। এই প্রভাব পরবর্তীকালে প্রায় নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকায় গিয়ে উপনীত হয়। এইভাবে প্রভাব বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের সর্বপ্রধান প্রতিনিধি সৈয়দ আহমেদকে দ্রুত গতিতে

সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদীতে পরিণত করতে সক্ষম হল।[১২] এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সুমিত সরকারের মতটি পরিধানযোগ্য। তিনি দেখিয়েছেন :

> *সৈয়দ আহমেদ সর্বদা জোর দিতেন মুসলমান হিসেবে উচ্চশ্রেণির মুসলমানদের মধ্যে পশ্চিমি শিক্ষা আমদানির প্রয়োজনীয়তার দিকে। আর এইভাবেই তাদের মধ্যে সংঘবদ্ধ ঐক্যের মনোভাব জাগিয়ে তোলার দিকে। তাঁর কর্মসূচি খাপে খাপে মিলে গেল নতুন ব্রিটিশ নীতির সাথে। ১৮৭১-এ মেয়োর ফরমাশে লেখা হান্টার-এর ইন্ডিয়ান মুসলমান বইটিতে তাকে সূত্রাকারে উপস্থিত করা হয়েছে এইভাবে : ব্রিটিশরা মুসলমানদের এক উদীয়মান প্রজন্মের বিকাশে সাহায্য করবে. . .' পাশ্চাত্যের ভব্য ও নম্র জ্ঞানে যারা অনুরঞ্জিত। সেই সঙ্গে নিজ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সম্ভ্রম আদায় করার জন্য তারা তাদের ধর্মবিধির সঙ্গেও পর্যাপ্ত পরিচয় রাখবে. . .'। ফলে আলিগড় বেশ অসঙ্গত পরিমাণ ব্রিটিশ পৃষ্টপোষণ লাভ করে, যার মধ্যে বড়লাট নর্থব্রুক-এর ব্যক্তিগত দান ছিল ১০,০০০ টাকা। এমনকি ফ্রান্সিস রবিনসন-এর মতকে (সেপারেটিজম অ্যামং মুসলিমস্, পৃ:১৩১) তুলে ধরে তিনি দেখিয়েছেন, সবকিছুর ওপরে ব্রিটিশ সমর্থনেই 'যে মানুষটির ধর্মীয় মতামত ছিল এতই মুক্ত যে তাঁর সহধর্মীদের অধিকাংশ তাকে ধর্মদ্রোহী বলে চিহ্নিত করত। তাঁকেই তুলে ধরা হল তাঁর সম্প্রদায়ের প্রবক্তা হিসেবে।*[১৩]

পাশাপাশি অধ্যাপক সরকার দেখিয়েছেন যে, ১৮৮০ এবং ১৮৯০-এর দশকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা যে সর্বভারতীয় রূপ নিয়েছিল তা দুটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে হয়েছিল- একটি উর্দূ ও দেবনাগরী হরফের বিরোধ এবং অন্যটি গো-সংরক্ষণ আন্দোলন নিয়ে বিরোধ। তবে হরফ বিতর্ক শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলমান সম্ভ্রান্তদের মধ্যেই ছিল এবং সাম্প্রদায়িকতাও শ্রেণিগতভাবে এক সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল। কিন্তু গো-সংরক্ষণ আন্দোলন তাকে আপামর জনসাধারণের ভূমিতলে নামিয়ে আনল। ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা গো-সংরক্ষণের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করল। তারা এই সংরক্ষনের জন্য আইন দাবি করল এবং যুক্তপ্রদেশের কোন কোন পৌরসভায় এই মর্মে কিছু সহায়ক আইন চালু করেছিল। তাতে বেশ কিছু কসাই এবং মুসলমান কাবাব ও খাদ্যের দোকানগুলি মার খেয়েছিল এবং মুসলমান সর্বসাধারণের মনে এরকম ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা নির্বাচন ও আইনের সাহায্য নিয়ে মুসলমানদের ধর্মানুমোদিত সামাজিক প্রথায় হস্তক্ষেপ করছে।[১৪]

১৮৮১- সালে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী 'গৌকরুণানিধি' এই শিরোনামে একটি পুস্তিকা লেখেন এবং এর পরেই 'গৌরক্ষিনী সভা'র আবির্ভাব হু এবং অল্পকালের মধ্যেই তা স্থানে স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে সারা দেশ জুড়ে চালানো হয় গো-হত্যা বিরোধী প্রচার। অর্থনীতি ও জনস্বাস্থ্য এই দুই এর যুক্তি দিয়ে হিন্দুরা গোহত্যা নিবারণের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিল। অন্যদিকে 'দি মুসলমান' পত্রিকায় এসময় মুসলমানদের পক্ষে যুক্তি দেখানো হয়েছিল। এই পত্রিকায় বলা হয়-

> *'বকর-ঈদের দিন নির্বাচিত পশু উৎসর্গ করা বিধেয়, গো-হত্যা বাধ্যতামূলক নয়। মুসলমানগণ মাংসাশী সম্প্রদায়, দরিদ্র মুসলমানদের পক্ষে সস্তা ও সুলভ গো-মাংসের উপর নির্ভর করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না- আসলে হিন্দুদের ধর্মীয় বোধকে আহত করার জন্য নয়, নিজেদের দারিদ্রের জন্যই মুসলমান সম্প্রদায় গো-মাংস গ্রহণ করে।*[১৫]

ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্রের মতে, এই গো-হত্যা বিরোধী প্রচার মূলত চালানো হয়েছিল মুসলমানদের বিরূদ্ধে, ব্রিটিশদের বিরূদ্ধে নয়; ব্রিটিশ সেনা শিবির গুলিতে ব্যাপকভাবে গো-হত্যা চালানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ফলে এই আন্দোলন অনিবার্য ভাবেই সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়েছিল।[১৬] কংগ্রেস একটি সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী দল হলেও এই গোরক্ষার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলে এবং আইন প্রণয়নে গুরুত্ব দিলে মুসলমানদের কাছে কংগ্রেস ও গোরক্ষা আন্দোলনকারী উভয়েই পরিণত হল একটা চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। যা মুসলমান স্বাতন্ত্র্যতার পথকে প্রশস্ত করে তুলেছিল।

সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রীয়ায় মুসলিম মানস : জাতীয়তাবাদ হল কোন দেশের 'অখণ্ড জাতি'র চেতনা। কিন্তু ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের শুরুতে ভারতে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার কথা প্রচার করা হয়েছিল তা ছিল মূলত সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ। কেননা এসময় বাংলা তথা ভারতীয় নবজাগরণের ব্যক্তিত্ব এবং ভারতের নবোত্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি যারা এই জাতীয়তাবাদী চেতনা সঞ্চারে ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাদের মতাদর্শে ও কার্যকলাপে হিন্দুয়ানির বৈশিষ্ট্য ছিল প্রকট। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম', লোকমান্য তিলকের 'গণপতি' ও 'শিবাজি' উৎসব ইত্যাদি ভাবধারাকেই জাতীয় ভাবধারা বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এ'মেকি জাতীয়তাবাদ এমনকি রবীন্দ্রনাথকেও সাময়িকভাবে অবিভূত করেছিল। এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চেতনার ভাবধারা তৎকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল - যেখানে মূলত হিন্দু 'জাতি' (ধর্মের) শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরা হয়েছিল। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠে'র যে জাতীয় চেতনা, তার সাথে মুসলমানদের কোন সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে, বরং তা ছিল তাদের বিরুদ্ধে। নবজাগরণ থেকে উদ্ভূত এই জাতীয় চেতনার প্রকাশ পাওয়া যায় তৎকালীন সাহিত্যকর্মে। পাশাপাশি ভারতবর্ষে জাতি বলতে কেবল হিন্দু জাতি (সম্প্রদায়)-কে বোঝানো হয়েছে।

অধ্যাপিকা জয়া চ্যাটার্জী তাঁর গবেষণাতে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী চেতনার সংকীর্ণতা তথা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন :

> *নবজাগরণ যুগের উপন্যাস ও মহাকাব্যে মুসলিম নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের কথা পরোক্ষভাবে অনেক উল্লেখ করা হয়। আসলে সুনির্দিষ্ট মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদায়িক কর্মসূচি গ্রহণ করে এখানে হিন্দুত্বকে নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে 'মুসলমানিত্ব' সম্পর্কে একটি বিপরীত সংজ্ঞা ও তার বিরোধিতা এই হিন্দুত্বের চেতনার একটি অন্তর্গত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ ধরণের বিতর্ক মূলক প্রবন্ধ 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা'তে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জাতীয় প্রত্যাশা একটা অলস ও অকার্যকর স্বপ্ন। এই প্রবন্ধে সাহসের সাথে ঘোষণা করা হয় যে, হিন্দু-মুসলমান শুধু পৃথক নয়, মৌলিকভাবে অসমান, আর 'মিলন হয় সমানে সমানে,। শরৎচন্দ্র বলেন এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেকার পার্থক্যের মূল হল 'সংস্কৃতি'। সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা এখানে হালকা ভাবে দেওয়া হয়েছে - এখানে সংস্কৃতি হল মন ও অন্তরের বৈশিষ্ট্য, যা স্বভাবগতভাবে হিন্দুর আছে কিন্তু মুসলমানদের তা নেই। এমনকি তিনি বলেন মুসলমানেরা জাতীয়তাবাদী নয় কারণ উচ্চতর বোধশক্তি থেকে সৃষ্ট জাতীয়তাবোধ তাদের মূল প্রকৃতির কাছে অপরিচিত।*[১৭]

এইরূপ ধারণার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভারতে মুসলিম শিক্ষিত জনগণ ও নেতাদের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরোধিতা এবং নিজ সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক ভাবনা বা জাতীয়তার বিষয়টি অস্বাভাবিক ছিল না। একদিকে নিজ ধর্ম সংস্কারের চাপ এবং অন্যদিকে হিন্দুদের কলরব মুখরিত উত্থান, এই দুই-এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভারতীয় মুসলমান সমাজ এক বিপদজ্জনক অবস্থার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল- যা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার উত্থানকে প্রশস্ত করেছিল।

পৃথক রাজনীতির সূত্রপাত ও অগ্রগতি : এই সাম্প্রদায়িক চেতনার ফলস্বরূপ বিংশ শতকের প্রথম দিক থেকে মুসলিম উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুসলমানরা তাদের সম্প্রদায়গত বা জাতিগত চেতনাকে স্বতন্ত্র রূপ দিতেই তারা পৃথক মুসলিম রাজনীতির সূচনা করেছিল, যা ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদের সমর্থক জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধী। মনে করা হয় সৈয়দ আহমেদ ও তাঁর আলিগড় কলেজের প্রচেষ্টায় মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক সত্তা ও রাজনৈতিক সংগঠনের যে প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল, পরবর্তীতে তা মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। ১৮৯৯ সালে মহামেডান এডুকেশান কনফারেন্সের বার্ষিক সম্মেলন বসেছিল কলকাতায়, ফলে বাঙালি মুসলমানেরা তাদের সহধর্মলম্বী উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের নিকটবর্তী হচ্ছিল- যা মুসলমানদের আলাদা একটি রাজনৈতিক সংগঠনের ভাবনাকে জোরদার করেছিল। ইতিমধ্যে পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের নেতা নবাব সলিমুল্লাহ মুসলমানদের জন্য একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব নিয়েছিল। এই ধারা পথেই ১৯০৯ সালে ৩০ ডিসেম্বর

ঢাকায় অনুষ্ঠিত এডুকেশন কনফারেন্সে মুসলমানদের জন্য নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়- 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' নামে খ্যাত হয়। এরপর ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো আইনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক ভারতে মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করলে মুসলমানেরা একটি সর্বভারতীয় সত্তা লাভ করেছিল।

যদিও শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ১৯৩০-এর দশকেও মুসলমানেরা রাজনৈতিক সম্প্রদায় ছিল না। একেবারে শুরু থেকেই মুসলিম রাজনীতির মধ্যে অবস্থানগত এবং ভাবাদর্শগত বিচ্ছিন্নতা ছিল। এমনকি ১৯৩০-এর দশকেও মুসলিম রাজনীতি প্রাদেশিকতার ঘূর্ণাবর্তেই থেকে গিয়েছিল। যেহেতু বাংলা ও পাঞ্জাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের স্বার্থ অন্যান্য সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থ অপেক্ষা ভিন্ন চরিত্রের ছিল। আয়েষা জালালের বক্তব্যকে তুলে ধরে তিনি দেখাচ্ছেন ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ ''সংখ্যালঘু মুসলমান অধ্যুষিত প্রদেশগুলিতে মুষ্ঠিমেয় সংঘবদ্ধ মুসলমানদের বিতর্কসভা ছাড়া ভিন্ন আর কিছু ছিল না।'' ১৯৩৭ সালে নির্বাচনে আঞ্চলিক দলগুলি ভালো ফল করে অথচ সারা ভারত জুড়ে মুসলিম লীগের ফল ছল হতাশা জনক। এই নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল জয় এবং তার ফলে ঔদ্ধতত্যের কারণে আস্তে আস্তে সব বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীগুলি জিন্নার নেতৃত্বে পুণরুজ্জীবিত মুসলিম লীগের ছত্রছায়ায় জড়ো হয়।[১৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জিন্নাহ প্রথম জীবনে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী দলের সদস্য ছিলেন, যিনি সর্বদা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং এমনকি মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচনের অন্যতম বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের দ্বিতীয় পর্বে মুসলিম সাম্প্রদায়িক স্বার্থের এবং মুসলমানদের **"The Sole of Spokemen"** রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। যদিও ১৯৩৭-এর নির্বাচন পর্যন্ত মুসলিম লীগ তথা জিন্নার সাম্প্রদায়িক জিগির সোচ্চার হয়নি, তবে নির্বাচনোত্তর রাজনীতিতে কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রবল হয়। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ দারুণ ভাবে বিপর্যস্ত হয়। এমনকি পাঞ্জাব ও বাংলার মতো দুটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশেও মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। এরপর মুসলিম লীগ নতুন ভূমিকায় সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রসার ও জঙ্গি জিগিরে বিশ্বাসী হয়ে উঠল। 'ইসলাম বিপন্ন' ধ্বনি ওঠে, মোল্লা মৌলবিরা এবার আসরে নেমে পড়েন, ব্যক্তিগত ভাবে জিন্না এসব মোল্লা মৌলবিদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে তাদের সংযোগ প্রতিরোধ করার চেষ্ঠা তিনি করেননি। ততদিনে সম্ভবত তিনি বুঝে গেছেন সাম্প্রদায়িক সংগ্রামে জিততে হলে এ অস্ত্রের সহজ বিকল্প নেই। মুসলিম লীগের অভিজাত রাজনীতিতে এমন কিছু ছিলনা, যা সাধারণ মানুষকে টানতে পারে। তাই 'ইসলাম বিপন্ন' এই জিগির তুলে তাদের লীগের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসা অনেক সহজ হয়।[১৯]

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন- সমকালীন হিন্দু রাজনীতি, যা হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দুর স্বাধিকার রক্ষার নামে প্রত্যুত জিন্না তথা মুসলিম লীগের এই ভূমিকাকে পুষ্ট করেছিল। নির্বাচনের পর কংগ্রেসের মুসলিম গণসংযোগ কর্মসূচি ও মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান করার জন্য আহবান লীগের মতো হিন্দু মহাসভারও বিরূপতার কারণ হয়েছিল। তাই মহাসভা এর বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন করার জন্য সক্রিয় ঝাঁপিয়ে পড়ল, এর ফলে লীগের পক্ষে মুসলমানদের নিজ পতাকা তলে আনা সহজসাধ্য হয়ে উঠল। আর মহাসভার নিরন্তন মুসলিম বিরোধীতার প্রচার এই ধারণা সৃষ্টি করল যে এই দুই ধর্মালম্বীরা একই জাতির অঙ্গ হিসাবে আর একত্রে থাকতে পারবে না এবং এর ফলে লীগেরই উদ্দেশ্য সাধিত হল। ১৯৩৭ সালে মহাসভার অধিবেশনে তার সভাপতি বীর সাভারকার ঘোষণা করলেন, ''ভারতবর্ষকে আজ আর এক অবিভাজ্য ও সুসংহত জাতি মনে করা যায় না। পক্ষান্তরে এদেশে দুটি জাতি - হিন্দু ও মুসলমান।'' ১৯৩৯ সালে অনুষ্ঠিত মহাসভার সম্মেলনেও তিনি এই দ্বিজাতি তত্ত্বের কথা আরও জোর দিয়ে বলেছিলেন।[২০] যা সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাকে প্রবল করে তুলেছিল।

জাতি চেতনা ও রাজনীতির চূড়ান্ত পর্যায় : জাতিরাষ্ট্রের দাবি : অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান বিভেদের যে বীজ অনেক আগেই বপন করা হয়েছিল, ত্রিশের দশকের শেষে তা বিচ্ছিন্নতাবাদে পরিণত হয়েছিল। এসময়ে মুসলমানদের পৃথক বাসভূমির দাবির পশ্চাৎপট সৃষ্টি হতে থাকে। হিন্দু-মুসলমান একই বাসভূমিতে থাকতে পারেনা এধারণা

এমনকি একদা 'সারা জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্থা হামারা'র সঙ্গীত রচয়িতা মহম্মদ ইকবালকেও প্রভাবিত করেছিল। মুসলিম লীগের সভাপতি হিসাবে তিনি প্রস্তাব দেন যে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, সিন্ধ ও বালুচিস্তান এই চারটি প্রদেশ একত্র করে ভারতবর্ষের মধ্যেই মুসলমানদের জন্য একটি কেন্দ্রীভূত ভূখণ্ড গঠন করা হোক। ইকবালের পৃথক বাসভূমির ধারণাকে আরও সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত করেন কেমব্রিজের ছাত্র রহমৎ আলি। ১৯৩৩ সালে তিনি অনেকটা পরোক্ষভাবেই কাশ্মীরসহ চারটি মুসলমান প্রদেশকে নিয়ে 'পাকিস্থান' গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যেই মুসলিম লীগের নেতারা বিভিন্ন কংগ্রেস শাসিত গুলিতে মুসলমানদের দুরাবস্থা অনুধাবনের জন্য বিভিন্ন কমিটি নিয়োগ করে। মুসলিম লীগ 'পীরপুর রিপোর্ট', 'ফজলুল হক রিপোর্ট' প্রভৃতির মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করে কিভাবে কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের উপর অত্যাচার চলছে। বাংলার তৎকালীন মন্ত্রী ফজলুল হক ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশে মুসলমানদের জীবন সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে আর মসজিদ অপবিত্র করা হচ্ছে তার এক ভয়াবহ বিবরণ দেন।[২১] এইসব অভিযোগের ভিত্তিতেই ১৯৩৭-এর অক্টোবরে লীগের লক্ষ্নৌ অধিবেশনে মহম্মদ আলি জিন্নার অভিযোগ সাম্প্রদায়িক তিক্ততায় ভরা ছিল। এই সূত্র ধরে মুসলিম লীগের দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও পাকিস্থান দাবির উপক্রমিকা লক্ষ্য করা যায় ১৯৩৮-এর অক্টোবরে করাচীর প্রাদেশিক অধিবেশনে।

শেষ পর্যন্ত ১৯৪০ সালে মার্চ মাসে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবেই মুসলমানদের পৃথক জাতি হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। যদিও এখানে পাকিস্থানের কোনো উল্লেখ ছিল না। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত প্রদেশগুলি নিয়ে ভবিষ্যতে 'স্বাধীন রাষ্ট্র' গঠনের কথা বলা হয়। অন্যভাবে বলা যেতে পারে উক্ত প্রস্তাবে ভারতীয় মুসলমানদের 'সংখ্যালঘু' অবস্থা থেকে একটি 'জাতি'তে পরিণত হওয়ার ইঙ্গিত মেলে।[২২] অবশ্য লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেটি হল সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশকে বিভক্ত করার প্রস্তাব। এখানে আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র অথবা ইসলামের কোনো উল্লেখ ছিল না। এটি ছিল মূলত ভারতের মুসলমান মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়াদের ঐহ্যিক স্বার্থরক্ষার দাবি। উদীয়মান মুসলিম শিল্পপতিরা টাটা, বিড়লা প্রমুখ হিন্দু শিল্পপতিদের আধিপত্য মানতে রাজি ছিল না। মুসলিম ভূস্বামী ও কৃষক শ্রেণিও স্বার্থগত কারণে হিন্দু জমিদারদের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল। এই স্বার্থগত দাবির প্রেক্ষিতেই তারা রাষ্ট্র পাকিস্থানের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিল। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ বদরুদ্দিন উমর বলেছেন - ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার মাহাত্মে ধর্ম সম্প্রদায় পরিণত হয়েছিল জাতিতে এবং মুসলমানরাই ছিলেন এই জাতি তত্ত্বের ব্যাখ্যাকার। এর কারণ হিন্দু মধ্যবিত্তের সাম্প্রদায়িক শ্রেণিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য অপেক্ষাকৃত অগ্রসর সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসাবে পৃথক রাষ্ট্রের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু মুসলমান মধ্যবিত্তের সে প্রয়োজন ছিল। জিন্নার দ্বি-জাতি তত্ত্বের এই ছিল অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। পাকিস্থানের স্বপ্ন সত্য অর্থে ধর্মপ্রাণগত ভারতীয় মুসলমানদের ইসলামী জীবনযাপনের স্বপ্ন নয়, এ স্বপ্ন মূলত মুসলমান মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়া শ্রেণি স্বার্থ প্রতিষ্ঠার।[২৩]

যাইহোক এ মুসলিম জাতীয়তার মাধ্যমে মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের জন্যই ১৯৪০-এর পর মুসলিম রাজনীতি তথা লীগের রাজনীতি নতুনভাবে অগ্রসর হয়েছিল পৃথক রাষ্ট্র বা পাকিস্থান দাবির মধ্য দিয়ে। আয়েষা জালালের মতো মুসলিম রাজনীতির বিশ্লেষকরা দেখাবার চেষ্ঠা করেছেন যে এই 'পাকিস্থান' নামক পৃথক রাষ্ট্র ছিল একটি কৌশল মাত্র। আসলে এর মাধ্যমে তারা চেয়েছিল যাতে ব্রিটিশ ও কংগ্রেস তাদের পৃথক জাতীয়ত্বের দাবি মেনে নেয় এবং এমন এক সাংবিধানিক ব্যবস্থাপনা, যেখানে প্রদেশগুলির স্বাতন্ত্র্য ও কেন্দ্রে হিন্দু-মুসলিম সমতা থাকবে। কিন্তু বাস্তবে কংগ্রেসের মতো একটি সর্বভারতীয় সংগঠন ঐক্যবদ্ধ ভারতের জন্য মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং একটি আলগা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে সামান্যতম ক্ষমতা মুসলিম লীগকে দিতে রাজি ছিল না। কংগ্রেস নেতৃত্বের দুর্বলতা ও ঔদাসীন্যের জন্য ক্রমে পাকিস্থান দাবিটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। পাশাপাশি এসময় মুসলিম রাজনীতির জনপ্রিয়তার প্রসার ঘটে, যার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪৬-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগের নির্বাচনী সাফল্যে। কংগ্রেস ও লীগের নেতৃবৃন্দ দীর্ঘ আলোচনা সত্ত্বেও এই সাম্প্রদায়িক

স্বার্থের সমাধান হয়নি, ফলে ১৯৪৬ সালে সারা দেশে নেমে এসেছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ দিনের অন্তর্কলহ ও রক্তক্ষয়ের পর ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তের অঞ্চলগুলি নিয়ে গঠিত হয়েছিল মুসলমানদের জন্য স্বাধীন পাকিস্থান নামক 'জাতিরাষ্ট্র'।

মন্তব্য : অর্থাৎ উপরের আলোচনার মাধ্যমে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের প্রথমদিকে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার সঞ্চার হয়েছিল, সেখানে মুসলমানদের কোনো স্থান ছিল না বললেই চলে, বরং তা ছিল তাদের বিরোধী। এই বিরোধিতায় জায়গা থেকেই মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে পৃথক জাতিসত্ত্বার সঞ্চার হয়েছিল এবং তারা **'separate identity'** প্রতিষ্ঠার চেষ্ঠা শুরু করেছিল, ঔপনিবেশিক শক্তির 'বিভেদনীতি' যাকে দৃঢ়তা প্রদান করেছিল। এমনকি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষিতে ভারতীয়দের যে রাজনৈতিক সংগঠন অর্থাৎ জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাতেও সংকীর্ণতা দেখা গিয়েছিল। ভারতবর্ষে মুসলমানরা অনগ্রসর সত্ত্বেও কংগ্রেসের সংগঠন ও কর্মসূচিতে মুসলমানদের তেমন অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী নেতারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়কে 'অখণ্ড বা এক জাতি' চেতনায় বেঁধে রাখতে পারেনি। ঔপনিবেশিক শাসকদের মতো তারাও বিভিন্ন সময় সম্প্রদায়গুলিকে হিন্দু ও মুসলিম নামক পৃথক জাতি বা সম্প্রদায় বলে চিহ্নিত করেছেন এবং এজন্য তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রদায়গুলির জন্য সংরক্ষণের দাবি করেছিলেন। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে এই দুর্বলতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল। রাজনীতির মেরুদণ্ড সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিরাই এই ধারণাকে বজায় রাখতে চেয়েছিল নিজেদের স্বার্থের জন্য। প্রথমদিকে হিন্দুদের, পরবর্তীতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বার্থগত সংঘাত। এই স্বার্থগত সংঘাতের সূচনায় ফলেই মুসলমানদের একটা বৃহৎ অংশ কংগ্রেসী রাজনীতির বাইরে ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর মধ্যে নিজেদের স্বতন্ত্র রাজনীতির সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন এবং এই রাজনীতিই পরবর্তীতে মুসলিম জাতি চেতনার ধারণাকে প্রতিষ্ঠা দিতে সহায়কের ভূমিকা নিয়েছিল। পরবর্তীকালে এই মুসলিম জাতিগত স্বার্থচেতনার প্রেক্ষিতে যে পৃথক জাতিরাষ্ট্রের কথা তুলে ধরা হয়েছিল, সেখানেও এই উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বার্থ বিরাজমান ছিল; যে স্বার্থের সাথে দেশের সমস্ত অংশের বৃহত্তর সাধারণ মানুষের কোন সাদৃশ্য ছিল না। তবুও সাধারণ মানুষের বৃহত্তর অংশ এই মুসলিম রাজনীতি বা পৃথক জাতিরাষ্ট্রের জন্য আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগানো হয়েছিল, যেটা সমাজের উপর তলা থেকে নীচু তলার সাধারণ মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করা হয়েছিল ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতির দ্বারা।

তথ্যসূত্র :

১। পরিদর্শক, ২২ জুন ১৮৮৪ সংখ্যা, উদ্ধৃত মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়, জাতীয়তাবাদী জিন্না : চিন্তার ক্রমবিবর্তন, প্রগ্রেসিভ পাবলিকেশন, কলকাতা ২০০১, পৃঃ ১৫

২। বদরুদ্দিন উমর, সাম্প্রদায়িকতা, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা ১৯৯২, পৃঃ ১৭-১৯

৩। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পলাশি থেকে পার্টিশান, ওরিয়েন্ট ব্লাকসোয়ান, কলকাতা ২০০৯, পৃঃ ৩১৪-১৬

৪। তদেব, পৃঃ ৩১৪

৫। কাজী আব্দুল ওদুদ, ক্রিয়েটিভ বেঙ্গল, কলকাতা ১৯৫০, পৃঃ ৭২ উদ্ধৃত মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯

৬। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৪

৭। অমর দত্ত, ঊনিশ শতকের মুসলিম মানস ও বঙ্গভঙ্গ, প্রগ্রেসিভ পাবলিকেশন, কলকাতা ১৯৯৫, পৃঃ ৩৫

৮। Ayesha Jalal, Self and sovereignty : Individual and community in south Asian Islam Since 1850, 2000, pp: 44-48 উদ্ধৃতি শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৩

৯। বিপানচন্দ্র এবং অন্যান্য, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, কে পি বাগচি এন্ড কোম্পানী, কলকাতা ১৯৯৪, পৃঃ ৩৩১

১০। S. Abid Husain, The Destiny Of Indian Muslims, Asian publshing House, Bombay 1965, p: 24
১১। রঞ্জিত সেন, আধুনিক ভারতে ইসলামের আত্মজাগরণ আন্দোলন ও ইসলাম চর্চা, পরিমল ঘোষ সম্পাদিত 'আমাদের আধুনিকতার কয়েকটি দিক', সেতু প্রকাশনী, কলকাতা ২০১২, পৃঃ ৫৩
১২। পঞ্চানন সাহা, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক : নতুন ভাবনা, নায়েক এন্টার প্রাইজ, কলকাতা ১৯৯৭, পৃঃ ৯৫
১৩। সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত, কে পি বাগচি এন্ড কোম্পানী, কলকাতা ১৯৯৩, পৃঃ ৬৪
১৪। রঞ্জিত সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪
১৫। The Musalman, 1st February, 1907, উদ্ধৃত সুকান্ত পাল, সাম্প্রদায়িকতার নানা দিক, পৃঃ ৫৮
১৬। বিপানচন্দ্র এবং অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৩
১৭। জয়া চ্যাটার্জী, বাংলা ভাগ হল : হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশভাগ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ২০০৩, পৃঃ ১৯৪-২০০
১৮। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০১
১৯। সুকুমার সেন, ভারত বিভাগ : ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ, ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা ১৯৯৯, পৃঃ ৩২
২০। শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়, জিন্না : পাকিস্থান নতুন ভাবনা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিকেশন, কলকাতা ২০১০, পৃঃ ১২৯
২১। পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯১
২২। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৩-৪০৪
২৩। বদরুদ্দিন উমর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪